ANUSTUP/WINTER/2007
2nd chapter of the book

Surgit

প্রিয় নবির দেশে যাব

সুরজিৎ সেন

"ফকিররা গরিব জানতাম—কিন্তু তারা যে এত গরিব জানতাম না। তবু এই সীমাহীন দারিদ্রের মধ্যে ও অতিথি সেবায় উজাড় এই অমলিন অন্তঃকরণ কীভাবে টিকে আছে ভেবে আশ্চর্য হতে হয়। শুনেছি ফকিরেরা নাকি আল্লার কাছে ধনদৌলত স্বেচ্ছায় নেয়নি। ধনদৌলত নিলে মানুষকে পাওয়া যায়না—তাই ধনদৌলত ছেড়ে তারা মানুষকে নিয়েছে। আর এই ভয়ংকর দারিদ্রকে উপেক্ষা করে তারা যতই হাসতে পারুক, একে সহ্য করা খুব শক্ত। অভিজ্ঞতা থেকে এও দেখেছি, এঁদের দারিদ্র নিয়ে যতখানি উদ্বেগ আমার, এঁরা কিন্তু নিজেদের তত দরিদ্র বলে মনে করেন না। ততখানি উদ্বেগও এঁদের নেই।" এই কথাগুলো আমাকে বলেছিল লিয়াকত আলি বছর চারেক আগে এক বৈশাখের দুপুরে পানাগড় মোরগ্রাম হাইওয়ের ওপর এক ধাবায় বসে। জায়গাটা সাতকেন্দুরি আর চিনপাই-এর মাঝামাঝি, নাম ফকিরডাঙা।

লিয়াকত কে? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে একটু পিছিয়ে যেতে হবে। গত শতাব্দির আটের দশকের শেষের দিকে আমরা বন্ধু-বান্ধবরা মিলে কলকাতা থেকে একটি লিট্‌ল ম্যাগাজিন প্রকাশ করি। সেই লিট্‌ল ম্যাগাজিনের প্রথম সংখ্যা প্রকাশের সূত্রে মধ্যকলকাতার এক পানশালায় লিয়াকতের সঙ্গে আলাপ। সুদূর বীরভূম থেকে সে কীভাবে জানি এসে পড়েছিল। সম্ভবত আমাদের আর এক বন্ধু একরাম আলির বন্ধু হিসেবে। দুজনেই এক জেলার কবি কিনা। স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে লিয়াকত আলির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই বেশ বন্ধুত্ব হয়ে যায়। এমনকী সে রাতটা চন্দননগরে আমার বাড়িতে থাকবে বলে লিয়াকত মনস্থ করে। দুজনে হাওড়ার বাসে উঠি, কিন্তু কেন যে সে মাঝপথে নেমে যায় জানি না। পরে জিজ্ঞেস করলে বলেছিল 'মনে নেই।'

যাই হোক, তখনই জেনেছিলাম সাতের দশকে সিউড়ি কলেজে পড়তে পড়তে সে নকশাল আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে আর কিছু দিনের মধ্যেই পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। কয়েক বছ পর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে পড়াশোনা শেষ করে, সম্ভবত শ্রমিক কল্যাণের কথা ভেবেই সে কলকাতায় আসে লেবার ওয়েলফেয়ার

অন্যজন চিনের, এঁদের যখন দেখা হয় তখন এঁদের মধ্যে কারিগরি জ্ঞানের একটা আদান-প্রদান হয়। ভিন্ন দুটো জিনিস না হলে সিনক্রেটিজম হয়না। কিন্তু বাউল-ফকিররা মনে করেন সব এক। বেসিক ডিফারেন্সটায় এঁরা বিশ্বাস করেন না। এঁরা মনে করেন আমাদের আদি পিতা, আদি মাতা এক ছিল। দুটো রাসায়নিক পদার্থ রজঃ আর বীজ থেকে মানুষের জন্ম। সব মানুষের অর্ন্তবস্তু এক। তাহলে ফকিরদের আপনি সিনক্রেটিজম-এর অন্তর্ভুক্ত করবেন কী ভাবে?" কী বলব বুঝতে পারিনা। এরপরেও দীর্ঘ আলাপ চলে আমাদের। বেশির ভাগটাই আমি শ্রোতা। তার সংক্ষিপ্তসার এরকম : তুর্কি ভাষা থেকে আগত এবং বাংলাভাষায় গৃহীত 'ফকির' শব্দটির মূল অর্থ নিঃস্ব মানুষ এবং বিশিষ্ট উপাসক সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়। তুর্কিস্তানে এবং অন্যত্র নানাবিধ ফকির উপাসক সম্প্রদায় তাঁদের বিশিষ্ট মতবাদ, নাচ ও গানের বৈশিষ্ট্য নিয়ে এখনো বেঁচে রয়েছেন। দরবেশ এবং সুফিদের সঙ্গেও এঁরা মিলেমিশে গেছেন। ফকির, দরবেশ, সুফি বহু ক্ষেত্রে সমার্থক শব্দে পরিণত হয়েছে। বঙ্গে আগত তুর্কি বিজেতারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও তাদের ছিল নিজস্ব লৌকিক সংস্কৃতি এবং প্রাক ইসলাম নৃত্যগীতের উপাসনা পদ্ধতি। এই ফকিরদের একাংশ নৃত্যগীত বিরোধী ইসলামের নিয়ম কানুন মানতেন না। তাঁরা ছিলেন বেশরা অর্থাৎ যারা শরা বা শরিয়তি মানেন না। ভারতে এবং বাংলার লৌকিক উপাসকদের সঙ্গে এরা অতি সহজে মিলেমিশে এক মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিলেন। বাংলা ভাষার 'ফকির' শব্দটির অর্থ হচ্ছে (১) ভিক্ষুক (২) সাধনার জন্য অর্থ-বিত্ত-সমাজ পরিত্যাগ করে যে নিঃস্ব হয়েছে (৩) রস রতি এক গোপন সাধনাকে লালন 'ফকিরি' বলেছেন।

ধর্মীয় বিভাজনের কারণে ফকিররা মুসলমান সমাজে বাস করতে বাধ্য হন। ফকিরের সাধনা গৃহকর্মের সাধনা। শরিয়তি জীবনচর্যার সঙ্গে এর প্রবল বিরোধ। তাই প্রচলিত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এক গোপন সমাজ নির্মাণ করে এঁরা বাস করেন। এঁরা শরিয়ত অমান্য করেন। অত্যাচারিত হন, আঘাতকে পুরস্কার হিসেবে গ্রহণ করেন। অর্ধ যাযাবর বা সমাজের প্রান্তবাসীর জীবন বেছে নেন। এ সমস্ত মানুষ স্ব-সমাজে বাস করেও স্বতন্ত্র। তাঁদের চর্যাচর্যও বিচিত্র। আর বিচিত্র হল তাঁদের ইহবাদী মানবতা। এরা কেউ সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী নয়, বরং গভীরভাবে সংসারযুক্ত। এই ধরনের গৃহী সন্ন্যাসীদের উপর কোনো ধর্মীয় সামাজিক আইন প্রযুক্ত নয়, তাদের উপর কোনো সামাজিক আইন খাটে না। তাঁরা হিন্দু বা মুসলিম যে সমাজেই থাকুন না কেন, তাঁদের একটা দ্বৈত জীবন আছে। একটা জীবন-জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ-সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদিকে সামাজিক আইন অনুযায়ী নেয়—আবার অন্য জীবন সেই আইনের বেড়া ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে চায়। কিন্তু এঁরাও কোনো তৃতীয় সমাজ গড়তে পারেন নি। বঙ্গে, পূর্ববঙ্গে, ভারতবর্ষে কোথাও বাউল বা ফকির বলে কোনো সম্প্রদায় নেই। কেন্দ্র নেই, প্রবর্তক নেই। কোনো সাজপোশাক নেই। পোশাক দিয়ে এরা নিজেদের চেনায় না। আমি প্রশ্ন করেছিলাম, 'তবে যে

কোর্স করতে। কোর্স শেষ করে একটি নামী বেসরকারি সংস্থায় লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসারের চাকরি পায়। এরপর লিয়াকতের ভাষায় 'কয়েক মাসের মধ্যেই বুঝতে পারি এরচেয়ে বিপদের চাকরি আর নেই।' সুতরাং লিয়াকত চাকরি ছেড়ে বীরভূম ফিরে যায়। বাড়িতে তার মন টেকেনা। পারিবারিক ব্যবসা ভাল লাগেনা। অতপর সে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে, বেছে নেয় সম্পূর্ণ ভবঘুরের জীবন, আমার সঙ্গে যখন তার আলাপ, তখন সে, সমাজের প্রান্তবাসী এক প্রেমিক পাগল। ঘুরে বেড়ায় বাউল ফকিরতান্ত্রিকদের আখড়ায়, সামান্য কিছু পয়সা এদিক-ওদিক থেকে জুটিয়ে নেয়। কখনও বন্ধুদের বাড়িতে থাকে—অর্থাৎ যাকে বলে ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে। বীরভূম জেলায় সামান্য হলেও কবিখ্যাতি আছে লিয়াকতের। তার মেলামেশার জগতটাও অদ্ভুত। শিল্পপতি থেকে শুরু করে শিক্ষক, ব্যবসায়ী উকিল, রাজনৈতিক নেতা, তান্ত্রিক, বাউল, ফকির—সে এক বিচিত্র বর্ণময় জগত।

মাঝে বেশ কয়েক বছর লিয়াকতের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই হঠাৎ একসময় বন্ধুদের কাছে খবর পাই ক্যাথারিন নামে এক সুইডিশ তরুণীর সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে কেঁদুলিতে জয়দেবের মেলায় এবং দ্রুত সেই আলাপ পরিণত হয়েছে প্রেমে। শুধু তাই নয়, তারা উত্তরভারত ভ্রমণে বেড়িয়ে পড়েছে। আরও কিছুদিন পর খবর পাই লিয়াকত হয়তো সেই সুইডিশ তরুণীর সঙ্গে সুইডেনেই চলে যাবে। ভাবি এই বিচিত্র মানুষটির সঙ্গে আর দেখা হবে না। কয়েক বছর পরে এক বন্ধুর বাড়িতে একটি পত্রিকায় 'বাউল ও বিদেশিনী' শিরোনামে একটি লেখা চোখে পড়ে। লেখকের নাম লিয়াকত আলি। পত্রিকাটি বাড়ি এনে পড়ে জানলাম লিয়াকত তার ক্যাথরিন-পর্ব আর বাউলসঙ্গের অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছে। খোঁজ নিয়ে জানলাম, সে এদেশেই আছে। শুধু তাই নয়, সে নাকি দুবরাজপুরের কাছে কোথায় এক ফকিরদের পাড়ায় থাকে। সেখানে একটি প্রাথমিক স্কুল চালায়। স্কুলের নাম 'অচিনপাখি'। মনে পড়ল লিয়াকতের কবিতার বইয়ের নামও 'অচিনপাখি'।

২০০০ সালের শুরুতে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রকল্পে কাজ করতে গিয়ে মনে হয়, বাংলার ফকির সম্প্রদায়ের মানুষ কী ভাবে বেঁচে আছে সে কথা ঐ প্রকল্পের অন্তর্গত করা যায়। কেননা রিলিজিয়াস সিনক্র্যাটিজম ঐ প্রকল্পের অন্যতম বিষয় ছিল। অর্থাৎ সমাজের এই প্রান্তিক মানব সম্প্রদায়ের ধর্মবোধ কী, জীবনযাপন কী রকম—এসব জানার ইচ্ছে হয়। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে আসে শক্তিনাথ ঝা-র কথা। ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত তাঁর *বস্তুবাদী বাউল* গবেষণা গ্রন্থটি পড়া ছিল। বহরমপুরের অধিবাসী, কৃষ্ণনাথ কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক (এখন অবসরপ্রাপ্ত) এই মানুষটি গত ২৫ বছর ধরে শুধু বাউল ফকির নিয়ে গবেষণাই করেন নি, তাঁদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন। বহরমপুরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। সিনক্রেটিজমের কথা বলায় উনি হাসলেন। বললেন, "সিনক্রেটিজম বা সমন্বয় রাজনৈতিক কারণে হয়। আর সমাজে নিম্নবর্গের মধ্যে একধরণের সিনক্রেটিজম হয়। ধরুন, দুজন রাজমিস্ত্রি, একজন মুর্শিদাবাদের এবং

বাউলের গেরুয়া আলখাল্লা দেখি'। উনি বললেন, "ওটা গায়কের পোশাক, ওঁরা আলখাল্লা পরেন। আবার এমন মানুষ আপনি দেখবেন যে তিনি অফিসে কাজ করেন, ধুতি পাঞ্জাবি পরেন অথচ ফকিরি জীবনচর্যায় আছেন। তবে এঁদের সংসার জীবন অভিনব। অর্থ, বিত্ত এবং সন্তান এঁদের অপ্রার্থিত। সুখ নামে এক শুকপাখি কে হৃদয় ফাঁদে বন্দী করতে চান। জ্যান্ত মানুষকে মনোময় রূপে 'মনের মানুষে' পরিণত করেন। কেউ কেউ দেহস্থ ব্রহ্মবস্তুতেই মানুষ ধরেন। এ তত্ত্বে পরলোক নেই। ইহজীবনকে কত সুন্দর করা যায় তাই এ সমাজের সাধ্যসাধনা, দেহ তো মানুষের নিজের অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ। ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যই তো ব্যক্তির পরিচয়ের প্রধান উৎস। এ সব সাধক অনিবার্য কারণে দেহবাদী। 'নিজে করে জানাই' এঁদের জ্ঞান লাভের উপায়।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা ব্যক্তিগত পরিবারকেও এই মতবাদীরা স্বীকার করেন না। জন্মসূত্রে একজন সচেতন মানুষ একটি নির্দিষ্ট সময়, নির্দিষ্ট গুরুর কাছে এই জীবনচর্যা গ্রহণ করেন। মানুষ একক। একক মানুষেরা প্রয়োজনে ঐক্যবদ্ধ হয়। যুগলে সাধনা করে। নর ও নারী, ছেলে ও মেয়েকে স্বতন্ত্রভাবে গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে হয়। একক দিয়ে এখানে 'কুল' বা গোষ্ঠি গড়া হয়। নারীও স্বাধীন একক। এ সমাজের সাধনায় সন্তান প্রার্থিত নয়। সম্পত্তি বলতে 'গুরুধন', তা উত্তরাধিকারে সূত্রে কেউ পায়না, যোগ্য শিষ্য নিজ সাধনায় তা অর্জন করে। এখানে 'জীব' সাধনায় পরিবর্তন করে নিজেকে। নিজেকে জেনে, নিজেকে পরিবর্তন করাই বাউল-ফকিরের সাধনা। তার বহু পন্থা, বহু মত ও পথ। কিন্তু ইহজীবন এবং মানুষই এ সাধনার সব।

ঐ প্রকল্পে ফকিরদের অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি তার আরও কিছু কারণ ছিল। তবে ঐ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আয়োজিত আলোচনা সভায় (কলকাতায়) শক্তিনাথ ঝা বাউল ফকিরদের সম্পর্কে অনেক কিছুই বলেন। বলেন ফকিরদের ওপর মৌলবাদীদের অত্যাচারের ঘটনা। আর সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্যই নদীয়া-মুর্শিদাবাদের বাউল ফকিরদের নিয়ে উনি গড়ে তুলেছিলেন বাউল ফকির সংঘ ১৯৮৩ সালে। মৌলবাদীদের অত্যাচারের দু-একটি ঘটনা উনি শুনিয়ে ছিলেন।

১. ১৯৯৭ সালে নদীয়ার করিমপুরের গোয়াসে বাউল ফকির সম্মেলন হয়। সমস্ত রাজনৈতিক দল এতে যোগ দেয়। বহু মানুষের সমাবেশে দুদিন ধরে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী গান ও আলোচনা হয়। সে সময় কতিপয় বামপন্থী মানুষ আমাদের অভ্যর্থনা সমিতিতে থাকতে অস্বীকার করেন এবং ইসলামি সমাজ বাউল ফকিরদের নিন্দা করেও সম্মেলনের সাফল্যে নারাজ হন। ঐ বছরই মে মাসে এক মৃতের গোর-কফিন দিতে গেলে ফকিরদের লাঞ্ছিত করে তোজাম্মেল মৌলবীর নেতৃত্বে কিছু মৌলবাদী। মসজিদের মাইকে বাউল-ফকির বিরোধী নিরন্তর প্রচার চালানো হয়।

২. মুর্শিদাবাদের জলঙ্গীর ঝাউদিয়া গ্রামের আকবর আলি, সোলেমান মন্ডল,

হাকিম মন্ডল, হাফিজুর রহমান ইত্যাদি ফকিরদের ওপর অত্যাচার শুরু হয় ১৯৯৯ সালের ১০ই জুলাই। ঐ দিন তাঁদের মসজিদে নিয়ে গিয়ে বাউল-ফকির মতবাদ ত্যাগ করতে বলা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গান গাওয়া ও গাঁজা খাওয়া। এঁদের মধ্যে দুজন আর্থিক জরিমানা দিয়ে রেহাই পান। আকবর ও হাকিমকে একঘরে করা হয় এবং দৈহিক অত্যাচার করা হয়। বাউল-ফকির সংঘের পক্ষ থেকে থানায় বিষয়টি জানানো হয়। নজরুল মন্ডল, কুদ্দুস মণ্ডল ইত্যাদি মৌলবাদীরা থানায় গিয়ে ধর্মীয় নিপীড়ন না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গ্রামে ফিরেই অত্যাচার শুরু করে। আকবর এবং হাকিম গ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ঐ সময় লোকসভা নির্বাচন থাকায় রাজনৈতিক দল ও প্রশাসন এ ব্যাপারে নীরব ছিল।

৩. নদীয়ার থানারপাড়ার-র মোক্তারপুর গ্রামের নাসিরুদ্দিন আহম্মদের গুরু হলেন মুর্শিদাবাদের সোনাটিকরির সিদ্দিক ফকির। এ গ্রামে জাহিরুল, আমিদুল, হানিফ মন্ডল (পঞ্চায়েত সদস্য) সকলেই সিদ্দিকের কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। দু'বছর আগে একদিন সিদ্দিক ফকির চরমোক্তারপুর এলে সবুর আলি মন্ডল এবং তপসীর মৌলনা সদলবলে তাঁর উপর চড়াও হয় এবং তাঁর গ্রামে ঢোকা নিষিদ্ধ করে দেয়। উক্ত চার শিষ্যকে মসজিদে ডেকে ফকির মত ত্যাগের 'তোওবা' করানো হয়। কিন্তু শিষ্যেরা গোপনে ফকিরি মত পালন করতে থাকে। ২১/২/২০০০ তারিখে সিদ্দিক ফকির দীর্ঘদিন পরে আবার শিষ্যদের বাড়িতে আসে। আবার চারজনকে শাস্তি দেওয়া হয়। এবার ঈদের নমাজ পড়তে দেওয়া হয়না তাঁদের। একঘরে করার ভয় দেখানো হচ্ছে!

৪. ১১ মার্চ ২০০০ লালবাগ থানায় তেঁতুলিয়া গ্রামের আকালি শেখ হরিশপুরের আলিবক্স ফকিরের শিষ্য হন। বাড়িতে ফিরে তিনি তাঁর মা-বাবাকে 'জয়গুরু' বলে প্রণাম করেন। এতে পরিবারের অনেকে অসন্তুষ্ট হন। ২১ মার্চ রাত ৮টা নাগাদ তেঁতুলিয়া বেসরকারি মাদ্রাসার মৌলবির নেতৃত্বে একদল লোক আকালির বাড়িতে এসে তাকে ফকিরি মত ত্যাগ করতে বলে। আকালি রাজি হয় না। তখন আকালির বাবা রেগে গিয়ে তাকে জুতো মারেন। আকালি তাঁর জুতোকে 'জয়গুরু' বলে প্রণাম করেন। পারিবারিক কারণে ভাইদের সঙ্গে তাঁর সমস্যা ছিল। ফলত তাঁর দুইভাই ও মৌলবাদীরা মিলে আকালিকে মারতে শুরু করে। আকালির মাথা ফাটে এবং পা ভেঙ্গে যায়। আকালির শিশুপুত্র বাবাকে বাঁচাতে এলে, তার পায়ের আঙুল শাবল দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়। আকালির স্ত্রীকেও মারা হয়। আহত আকালি পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ জানায় ও আশ্রয় নেন। কিন্তু মৌলবাদীদের চাপে ফাঁড়ি তাঁকে লালবাগ থানায় পাঠিয়ে দেয়। ইতিমধ্যে বাউল-ফকির সংঘ থানায় ডায়ারি করে। থানা থেকে আকালিকে পাঠানো হয় লালবাগ হাসপাতালে। সেখানে তাঁর চিকিৎসা হয়। বাউল-ফকির সংগঠন পেশায় জনমজুর আকালির চিকিৎসার খরচা বহন করে। তাঁর স্ত্রী পুত্রের দেখাশোনা করে। পরদিন সকালে থানা থেকে পুলিশ তদন্ত করতে গেলে, মৌলবাদীরা বলে, যে, আকালি গাঁজা খেয়ে নিজেদের মধ্যে মারপিট

করেছে। পুলিশ ফিরে যায়। ২৭ মার্চ সংগঠন মুর্শিদাবাদের জেলাশাসককে এবং পুলিশপ্রধানকে ঘটনাটা জানায়। ইতিমধ্যে দৈনিক আজকাল ও দৈনিক কালান্তরে ঘটনাটি প্রকাশিত হয় (৪/৪/২০০০)। পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করে কিন্তু স্থানীয় মৌলবাদী ও রাজনৈতিক চাপে তাদের ছেড়ে দেয়।

অত্যাচার আকালিকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ করে তুলেছে। সে ভাঙা পা নিয়ে দূর গ্রামে সাইকেল চালিয়ে কাজে যায়। দূরে, কারণ স্থানীয় ধনীরা তাঁকে বয়কট করেছে। ঐ আলোচনা সভায় নদীয়ার করিমপুর থেকে অর্জুনদাস বাউল এসেছিলেন। তিনি একটা লালনের গান শুনিয়েছিলেন :

'জাত গেল জাত গেল বলে/এক আজব কারখানা/সত্যপথে কেউ নয় রাজী/সব দেখি তা না না না/যখন তুমি ভবে এলে/তখন তুমি কী জাত ছিলে/কী জাত হবে যাবার কালে/সে কথা কেন বলনা।

গানের শুরুতে উনি 'আল্লা হু আকবর' বলে আমাদের চিরপরিচিত আজানের সুর লাগিয়েছেন। অর্জুন কে প্রশ্ন করেছিলাম 'লালন, যিনি শরিয়তে সম্পূর্ণ বিরোধী তার গানে শরিয়তী আজানের সুর কেন?'

অর্জুন বলেছিলেন 'আসলে ছোট থেকে ওই ভোরের আজানের সুর শুনছি। এত ভাললাগে তাই আমার ভাললাগা গানের সঙ্গে এটা জুড়ে দিয়েছি। পার্থক্য আপনারা খোঁজেন—আমি জানিনা। এই তো শান্তিনিকেতনে পৌষমেলায় গিয়ে দেখি বাউল আর ফকিরদের জন্য দুটো আলাদা তাঁবু। কেন? বাউল-ফকির এক জায়গায় গাইছে, এক দেহতত্ত্বের কথা বলছে, এক সঙ্গে খাচ্ছে—তাহলে থাকার জায়গা আলাদা কেন?' সত্যিই এর কোনো উত্তর আমার জানা নেই।

শক্তিনাথ বললেন 'সহজিয়া শব্দটা আমরা তৈরি করেছি, শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা। আমরা জেনারালাইজ করতে চাই, ক্লাসিফায়েড করতে চাই, যাতে অমাদের সংজ্ঞার বাইরে কেউ না থাকে। এই কারণে কিছু কিছু শব্দ আমরা তৈরি করি। আমরা ক্যাটাগরি তৈরি করি। এটা ঔপনিবেশিকরা আমাদের শিখিয়েছে। বাউল একটা ক্যাটাগরি—এটা আমরা তৈরি করেছি। বাউলদের মধ্যে কেউ সংসারে আছেন, কেউ সংসার ছেড়ে চলে গেছেন। তখন নানা রকম প্রশ্ন ওঠে। বাউলদের বিবাহরীতি বলে কিছু নেই। এ বিষয়ে কিছু না বলাই ভালো। কারণ প্রচলিত মূল্যবোধের সঙ্গে ওদের মৌলিক মূল্যবোধের কোনো মিল নেই। আমরা শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা লোকজীবনের সব কিছু কে বিজ্ঞানসম্মতভাবে জানতে চাই। আমাদের জানার বাইরে যেন কিছু না থাকে। শব্দের অর্থ আমরা Fix করে দিই। ওঁরা শব্দের অর্থ ভাঙ্গেন। এই ভাঙার প্রতিবাদী ধারাটাই বাউল ফকিরের ধারা। এই জন্য আমাদের আছে Fixtation, ওদের আছে Flexibility। যেটা পুরোপুরি স্ট্রাকচার নয়। Fluidity আছে। যা সব সময় পরিবর্তিত হচ্ছে। যেমন, আজানের যে সুর তার একটা নির্দিষ্ট রাগ আছে—রাগিনী আছে। শিল্পীতো রাগ-রাগিনী গাইবেন। আপনি যদি এভাবে

দেখেন হিন্দু না মুসলিম কে গাইছে? শরিয়তী আজান আর বেশরয়তী লালনের গান এক সঙ্গে গাইছে কী করে? তাহলে বাউল-ফকিরদের আপনি বুঝতে পারবেন না। বাউল-ফকিরদের সাধনা দেহকে কেন্দ্র করে, সেটা সম্পূর্ণ গোপন এক জীবনচর্যা। ভারতবর্ষে, চীনে এমনকী সারা পৃথিবীতে অনেকগুলো চর্যা প্রচলিত ছিল, বিভিন্ন জায়গায় তার বিভিন্ন নাম। দেহকে কেন্দ্র করে প্রচলিত বর্ণশ্রেণি সংস্কৃতির বিভাজনগুলোর বিরুদ্ধে যে আরেকটা কাউন্টার কালচারাল ওয়েভ সারা পৃথিবীতে ছাড়িয়ে পড়েছিল এটাকেই আমরা বলছি বাউলচর্যা। এঁরা প্রচলিত ক্যাটাগরির বাইরেই রয়ে গেছেন। ভারতীয় সমাজকে পণ্ডিতেরা দু ভাগে ভাগ করেছেন ত্যাগি এবং গৃহস্থ। বাউল-ফকির সহজ তান্ত্রিক এঁদের অবস্থান মাঝামাঝি। এরা পুরো গৃহস্থ ও নয় আবার পুরোপুরি ত্যাগিও নয়।'

স্বেচ্ছাসেবী প্রকল্পের কাজ শেষ হয়ে গেলেও ফকিরদের ব্যাপারটা মাথা থেকে যায়নি। এই সূত্রে লাভ যেটা হল তা শক্তিনাথ ঝা-এর সঙ্গে পরিচয়, যা পরে শিক্ষক ছাত্রের সম্পর্কে পরিণত হয়েছে।

এবার লিয়াকত সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে শুরু করি। কেউ খুব একটা কিছু বলতে পারে না। অনেক খোঁজখবর করে জানতে পারি সে ঐ ফকিরদের পাড়াতেই আছে। রওনা হই লিয়াকতের উদ্দেশ্যে। বৈশাখ মাসের শেষ তখন। বীরভূমের সূর্য তখন আগুন ঢালছে। দুবরাজপুর আর চিনপাই-এর মাঝামাঝি পানাগড় মোরগ্রাম হাইওয়ের ওপর সাতকেন্দুরি বলে এক গ্রাম। সেখানে বাস থেকে নেমে এক কিলোমিটার হাঁটলে ফকিরডাঙা। জায়গাটা চমৎকার। হাইওয়ে থেকে মেঠোপথ ধরে খানিকটা গেলে সাঁইথিয়া-আন্ডাল রেলাইন। রেললাইন পেরোলেই লিয়াকতের দু কামরার ঘর। ঘর থেকে রেললাইনের পাশ ধরে দুবরাজপুর ষ্টেশনের দিকে কয়েক পা হাঁটলেই আলমবাবার মাজার। মাজারের ধরে ঘেঁষে চলে গেছে রেললাইন। সারাদিন হয় মালগাড়ি নয় প্যাসেঞ্জার ট্রেনের যাওয়া আসা। মাজারের পাশেই এক বিরাট বটগছ। রেললাইনের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। দুর থেকে ট্রেনের যাওয়া আসা দেখলে মনে হয় গাছ ফুঁড়ে ট্রেন বেরিয়ে এল। চারপাশে যতদূর চোখ যায় ধানজমি, শুধু মাঝখানে চওড়া কালো বর্ডারের মতো চলে গেছে হাইওয়ে। দেখা হল লিয়াকতের সঙ্গে। বহুদিনের অদর্শনেও আমাকে চিনতে পারল। একগাল হেসে বলল, 'এসো এসো কী ব্যাপার? আমি তো কোনোদিন ভাবিইনি আমাদের আবার দেখা হবে।' বললাম, "আমিও ভাবিনি।" আলাপ হল অল্পবয়সী মোফিয়া, লিয়াকতের বউ এবং সাতবছরের ছেলে মনসুরের সঙ্গে। দুচার কথার পর লিয়াকতকে জিজ্ঞেস করি 'কী ভাবে এদের মাঝে এসে পড়লে? লিয়াকত হেসে বলে 'চলো'। দুজনে হাঁটতে হাঁটতে হাইওয়ের ওপর আসি। লিয়াকতের পরিচিত ধাবায় বসি। বৈশাখের রোদে চারপাশে ঝলসে যাচ্ছে। হাইওয়ের ওপর মরীচিকা দেখা যায়। দূর থেকে দেখলে মনে হয় রাস্তায় জল পড়ে আছে। কাছে গেলে ভুল ভাঙে। খাটিয়ায় বসার পর চা আসে। লিয়াকত সিগারেটে গাঁজা (ফকির-বাউলের ভাষায় যা তামাক বলে

পরিচিত) ভরে ধরায়। দু-চারটান দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দেয়। আমি হেসে প্রত্যাখ্যান করায় বিস্মিত লিয়াকতের প্রশ্ন 'সে কি! কবে থেকে?' জানাই ডাক্তারের নির্দেশে আজ ৮/৯ বছর তামাক খাওয়া বন্ধ। লিয়াকত হেসে বলে "এই তোমাদের দোষ। শরীরটা তোমার, তুমি তাকে রসে-বশে-আনন্দে রাখ। তা নয়, এমন বাড়াবাড়ি করবে যে শরীরটা ডাক্তারের হাতে চলে যাবে। তারপর বাকি জীবনটা ডাক্তারের নির্দেশেই কাটাতে হবে। তামাক খাওয়া ছেড়ে দিলে মানে তোমার জীবন থেকে একটা গান খসে গেল।" জিজ্ঞেস করি "কোন গান"? 'বিশ্বনাথ বাউলের সেই গানটা ভুলে গেছ? মনে পড়ল বিশ্বনাথ বাউলের গানটা—

দ্যাখরে মা সরস্বতী/ছাগলে গিলেছে হাতি/কাঠবেড়ালি বেহালা বাজায়/গাঁজার নৌকা পাহাড় বাইয়া যায়

এ গানের মানে কী জানিনা, পুরো গানটাও মনে নেই, কার লেখা তাও জানি না। তবে বাউল ফকির-ভবঘুরে জগতের খুব জনপ্রিয় গান। সত্যিই এক পাহাড়চুড়ো থেকে আর এক পাহাড়চুড়োয় নৌকো বেয়ে যাওয়ার যে চিত্রকল্প, তামাক না খেলে, তামাককে না জানলে এ জিনিষ লেখা যায় না। পুরনো কথায় ফিরে যাই, লিয়াকত এখানে এসে পড়ল কী করে। "ক্যাথরিন আর আমি প্রয়াগ, বৃন্দাবন, হরিদ্বার হৃষিকেশ, দিল্লি, আগ্রা, আজমির শরিফ ঘুরে এলাম। ক্যাথারিন দেশে ফিরবে, সঙ্গে আমাকেও নিয়ে যেতে চায়। বলেছিল বিয়ে করার দরকার নেই তুমি চলো আমার সঙ্গে। আমি ভেবে দেখলাম সুইডেনে গিয়ে কী করব? সেখানকার ভাষা জানিনা, সেখানে কী কাজ করতে পারব জানিনা, সবচেয়ে বড় কথা সেখানে তো বাউল ফকিরদের আখড়া নেই। তারচেয়েও বড় কথা হল ক্যাথারিনের যখন আমাকে আর ভালো লাগবে না তখন আমি কোথায় যাবো? বা আমারও যদি ভালো না লাগে? ওকে বলে দিলাম আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। ও দুঃখ পেয়েছিল। আমিও পেয়েছিলাম। কিন্তু ওর পক্ষেও এদেশে থেকে যাওয়া সম্ভব নয়। ক্যাথারিন চলে যাওয়ার পর আবার এ আখড়া ও আশ্রম ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। মাঝে মাঝে বাড়িতে আসতাম মা-র সঙ্গে দেখা করতে। দুবরাজপুরে আমাদের বাড়ি, পারিবারিক লেদ মেশিনের ব্যবসা ছিল, এখনও আছে। আমাদের পরিবার রক্ষণশীল মুসলমান পরিবার। তারা কেউ আমার চালচলন, অধার্মিক মনোভাব পছন্দ করে না। সেই সত্তর সালে সমাজ পরিবর্তন আর বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিলাম তখন থেকেই আমি তাদের না-পসন্দ। কিন্তু মা আমাকে খুব ভালবাসত। একমাত্র মা-ই বলত "যা মন চাইবে করবি। মানুষকে ভালবাসবি।" তো তখন সিউড়ি কলেজে পড়ি, চারপাশের অব্যবস্থার বিরুদ্ধে, ভাঙার উন্মাদনায়, রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লাম। ধ্যান-জ্ঞান ছিল চারু মজুমদারের লেখা আর ছবি। কিছুদিন পর পুলিশি অত্যাচারের চাপে আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেলাম। সেখানে গিয়ে ভুল ভাঙল। নিজেদের মধ্যে এত ভুল বোঝাবুঝি, এত মত পার্থক্য, সব সময় ষড়যন্ত্রের ভূত দেখা—ভাবলাম এ কাদের সঙ্গে কী করছি আমি? মাসের পর মাস বাড়ি ছাড়া,

পয়সা নেই, রোজ ঠিকমত খাবার জোটেনা এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে পালিয়ে বেড়ানো, তারপর পুলিশের হাতে ধরা পড়ে দমদম সেন্ট্রাল জেলে চালান হয়ে গেলাম।

জেলে গিয়ে দিব্যজ্ঞান লাভ হল। বুঝতে পারলাম রাষ্ট্রের চেহারাটা কী? এও বুঝলাম, যে, বিপ্লব করে ক্ষমতায় এলেও জেল থাকবে, পুলিশ থাকবে, এই রাষ্ট্রটাও থাকবে। যে ক্ষমতায় যাবে সে এই রাষ্ট্রটাই দখল করবে এবং একই রকম অত্যাচার করবে বিরোধীদের ওপর। তারপর যাই হোক, জেল থেকে বেরিয়ে পড়াশোনা শেষ করে কলকাতায় গেলাম। তখন ঘোর কংগ্রেস আমল। কলকাতায় লেবার ওয়েলফেয়ার পাশ করে, বিড়লা লিনোলিয়ামে লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসারের চাকরি আড়াই বছরের বেশি করতে পারিনি। তারপর থেকেই আমি ভবঘুরে। আর এই ভবঘুরে জীবনে বাউল ফকিরদের সঙ্গে মিশে বুঝেছি আত্মজয় না হলে যে কোনো জয়ই প্রকৃতপক্ষে পরাজয়। ১৯৯১/৯২ সাল নাগাদ আমি আলমবাবার মাজারে আসি। জালাল শা-র সঙ্গে আলাপ হয়। তার আগে যখন দুবরাজপুরে বাড়িতে আসতাম তখন জালাল শার বাবা তায়েব শা কে দেখতাম ঘোড়ার পিঠে চেপে চলেছেন। হাতে সর্পাকৃতি বাঁকানো লাঠি তাতে সাপের চোখে পাথর বসানো। কোমরে বাঁধা করোয়া (লাউয়ের খোলের বড় পাত্র, কালোর রঙের)। ফকির চলেছেন শিষ্য বাড়ি বা অন্য কোথাও। দেখতে ভারি ভালো লাগত। রাস্তায় লোকে ফকির সাহেবের হাত ধরে মোসাফা করার সময় পাঁচ টাকা গুঁজে দিচ্ছে।

জালাল শা-র সঙ্গে আলাপ হবার পর এখানে আসা শুরু হল। জালাল শা গান করতেন। আরও সব ফকিররা আসতেন। গান হচ্ছে, তত্ত্বকথা হচ্ছে, ছিলিম পুড়ছে। ক্রমে এ জায়গাটা ভাল লাগতে শুরু করল। ক্যাথারিনকে নিয়েও এখানে আসতাম। এ জায়গাটা দেখেই তুমি বুঝতে পারছ এখানে প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকার একটা ব্যাপার আছে। নিম্নবর্গের মানুষ এখানে হাঁফ ছাড়তে আসে, মাজারে মনের কথা বলতে আসে। আমারও মনে ধরে গেল। তখন দুবরাজপুরে এলে আমি থাকতাম ওখানকার অটলবিহারি দরবেশ আখড়ায়, গঙ্গাধর মহান্তর কাছে। ওদিকে গঙ্গাধর আর এদিকে জালাল শা—এই ছিল আমার দুই ডানা। দুই ডানায় ভর করে আমি উড়তাম। ক্যাথারিনকে দরবেশ আখড়াতেও নিয়ে গেছি। এদিকে বাড়ি থেকে চাপ আসছে বিয়ে করে সংসারি হবার জন্য, ব্যবসা দেখাশোনা করার জন্য। আমার এক কাকা দুবরাজপুর কোর্টের নাজির ছিলেন। তিনি তাঁর মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। এবং পণ হিসেবে প্রচুর টাকা দেবেন এরকম প্রতিশ্রুতিও দিলেন। শুধু তাই নয়, কীভাবে ব্যবসা বাড়ানো যায়, নতুন কী কী ব্যবসা শুরু করা যায় এ ব্যাপারে পরামর্শ দিতে থাকলেন। আমি দেখলাম চারপাশে যদি পরামর্শদাতার ভিড় বেড়ে যায় তাহলে খুব মুশকিল। আর এও ভেবে দেখলাম, যে জীবন আমি যাপন করি তাতে সমাজের মূলস্রোতে আমি কমপ্লিটলি মিসফিট্। আমার পক্ষে বিয়ে করে সংসার করা, সামাজিকতা রক্ষা করা

অসম্ভব। আসলে আমার তো প্রিয় নবির দেশে যাবার নেশা। আমি বলি প্রিয় নবির দেশে যাব/পাল তুলে দে/নৌকার পাল তুলে দে গানে যেমন বলেছে, হ্যাঁ তারপর কী যেন?' 'পুরোটা জানিনা।' 'যতটুকু জানো বল'—

'দো জাহানের বাদশা যিনি/পারে লাগাবেন তিনি/সেই যে পারের কাণ্ডারি/কদম ছুঁয়ে নে/আরসেতে আল্লা ছিল/মদিনায় মহম্মদ হল/মুর্শেদ আমায় বলে দিল/কলমা পড়ে নে—এরপর আর জানিনা।' লিয়াকত বলে 'এরপর হল 'আউলে আখেরে নবি/জাহেরি বাতুনে নবি/নবির নবি মহানবি/স্মরণ করে নে।'—এই প্রিয় নবির দেশে যাবার নেশা। যেতে হয়তো পারব না কিন্তু যাবার নেশা ছাড়তে পারি কই?' 'এটা তো বাউল গান। মাটিয়ারিতে গৌর খ্যাপার বাড়িতে শুনেছি ১৯৮৮/৮৯ সালে।' বলেই লিয়াকতের ধমক খাই 'আঃ, গানের আবার বাউল ফকির কী? হিন্দু গাইলেই বাউল আর মুসলমান গাইলেই ফকির? এতো দেহতত্ত্বের গান 'তুমি ভাবটা বোঝো।' আমার দুপাতা বইপড়া জ্ঞানের লোভ সামলোতে না পেরে বলি 'কী অদ্ভুত আকুতি। নদীমাতৃক দেশের পদর্কতা তার প্রিয় নবির দেশে যাবার জন্য নৌকার পাল তুলে দেবার কথা বলছে। যে দেশটা মরুভূমির মাঝখানে।' লিয়াকত হেসে বলে 'ঠিকই, তবে এটা বাইরের মানে। ভেতরের মানেটা আলাদা।' 'কি রকম?' 'প্রিয় নবির দেশটা তোমার শরীরের ভেতরেই আছে, দেহনদীতে নৌকা বেয়েই মানে নারী-পুরুষের মিলনের মধ্যে দিয়েই তোমাকে সেখানে যেতে হবে। নারী-পুরুষের দুটো শরীর অর্থাৎ দো জাহান। সেই দো জাহানের বাদশা হলেন নবি। তিনিই তোমাকে দেহনদী পার করিয়ে নিজের দেশে নিয়ে যাবেন, তাঁর কদমবুসি করতে হবে। তবে সে দেশে তোমার একার বা যে কোনো পুরুষ কি নারীর একার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব। তোমাকে ধরতে হবে গুরু বা মুর্শেদ, তাঁর বায়েদ (শিষ্য) হতে হবে। তিনি তোমাকে চিনিয়ে দেবেন প্রিয় নবির দেশ আর পড়িয়ে দেবেন দিল কোরাণের কলমা। আউল, বাউল, ফকিরি চর্যাই শেষ পর্যন্ত নবির কাছে নিয়ে যাবে। সে নবি জাহেরি (প্রকাশ্যে) আর বাতুনে (গোপনে) দুজায়গায় আছেন। হজরত মহম্মদ আল্লার কাছ থেকে পাওয়া ৯০ হাজার কলমার মধ্যে ৩০ হাজার কলমা জাহির বা প্রকাশ করেছেন। যা আমরা কোরাণে পড়ি। শরিয়ত আর আল্লার কাছ থেকে পাওয়া ৫০ হাজার কলমা তিনি বাতুনে বা গোপনে রেখেছেন। মারফতি গুরু বা মুর্শিদের কাছে বায়েদ হলে সে কলমা পড়া যায়। সে কলমা গুরু-শিষ্য পরম্পরায় মুখে মুখে চলে আসছে, এই হল দিল কোরাণের কলমা। ১০ হাজার কলমা তার সিনায় পোরা আছে। যা সাধনার শেষ স্তরে না পৌঁছলে জানা যায় না। সেকারণেই তোমায় মনে রাখতে হবে মহানবি বা হজরত মহম্মদের কথা' লিয়াকতের কথা বুঝতে পারি না। তবে এটুকু বুঝতে পারি আমি একটি মূর্খ। ইতিমধ্যে আবার চা আসে। 'হ্যাঁ, কী বলছিলাম যেন' লিয়াকত আবার শুরু করে 'যে আমার পক্ষে সমাজের মূলস্রোতে থাকা মুশকিল। তখন ভাবি কী করি। জালাল শা-র কাছে যাওয়া আসার সূত্রে সোফিয়া আমাকে চিনত। আর

আমি জানি আমার নিজের কিছু নেই, বিয়ের পর বউ কিছু চাইলে দিতে পারব না। তাই ভাবলাম ফকিরের মেয়েকেই বিয়ে করি। সে কিছু চাইবে না। জালাল শাকে প্রস্তাব দিই এবং ফকিরডাঙাতেই থাকার ইচ্ছে প্রকাশ করি। সোফিয়ার তখন ২০/২১ বছর বয়স। উনি সম্মতি দিলে এখানে থেকে যাই।

এই বিয়ে আমার পরিবারে কেউ মেনে নেয়নি একমাত্র মা ছাড়া। দুবরাজপুরে জমি ব্যবসা সব আমার নামে ছিল। সব মিলিয়ে লাখ চারেক টাকার ব্যাপার। কিন্তু আমি কোনোদিন কিছু দেখিনি, ভাই সব দেখত, চালাত। আড়াই বছর বিড়লার চাকরি বাদ দিলে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি কোনো টাকা রোজগার করিনি। তো বিয়ের পর টাকা পয়সার দরকার। ভাইকে বললাম, বাড়ি ব্যবসা ওর নামে করে দিচ্ছি, ও আমায় অর্ধেক দাম দিক। ভাই হ্যাঁ-না কিছু বলে না। বাড়িতে গেলে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। এখানকার কেউ কেউ আমাকে মামলা করার পরামর্শ দিল।

কিন্তু এই অঞ্চলে লোকে আমাকে এত ভালবাসে, সম্মান করে, সেই আমি যদি ভাইয়ের বিরুদ্ধে মামলা করি তাহলে লোকে কী ভাববে? ইদানীং এখানকার লোক আমাকে মাস্টার বলে ডাকে। কেন কে জানে। তোমাকে দুটো ঘটনা বলি। তখন ক্যাথারিন আমার সঙ্গে থাকত। এই দুবরাজপুরেই এক হোটেলের বেয়ারা তার মালিককে আমাকে দেখিয়ে বলছে যে, এই লোকটার চলে কী করে? ওর তো কোনো রোজগার নেই। মালিক ধর্মপ্রাণ মুসলমান। বলে, ও কি আর মুসলমান আছে? ও খ্রিষ্টান হয়ে গেছে। দেখছ না ওর পেছনে মেম ঘুরছে। ওর এখন অনেক পয়সা।

এ তো গেল মুসলমানদের কথা। দুবরাজপুরের অটলবিহারি দরবেশ আখড়ায় উত্তর ২৪ পরগনা থেকে এক সাঁই মা আসতেন। খুব সুন্দরী। আমাকে বেশ পছন্দ করতেন, হরিদাস বলে ডাকতেন। ওখানে দীনবন্ধু বলে একজন থাকত, একদিন ভরা আসরে সাঁই মা-র সঙ্গে কথা হচ্ছে নানা বিষয়ে। উনি হরিদাস নামে ডাকছেন। দীনবন্ধু বলে উঠল 'ও কি আর মুসলমান আছে ও হিন্দু হয়ে গেছে।' এই হল ব্যাপার।

এখানে কোনো ডাক্তার আমার থেকে পয়সা নেয় না, দোকান-বাজারেও লোকে কিছু সুবিধে দেয়। থানা-পুলিশ-রাজনৈতিক নেতা সবাই আমাকে একটু অন্য চোখে দেখে। আর তাছাড়া এসব কোর্ট-কাছারি মামলা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। পঁয়ষট্টি হাজার টাকার বিনিময়ে ভাইকে সব লিখে দিয়ে এই ফকিরডাঙার চলে এলাম। আমি ভালই আছি। যে উদ্দেশ্যে এ জীবন বেছে নিয়েছি তাতে আমি সফল। হ্যাঁ অভাব আছে, তবে ওটা অভ্যাস হয়ে গেলে আর কোনো অসুবিধে নেই। লিয়াকত চুপ করে সিগারেটে তামাক বানিয়ে ধরিয়ে শুরু করে। এখন ছোটোখাটো পোলট্রির ব্যবসা শুরু করেছি। বলি 'কী রকম চলছে', এতদিন তো টাকা পয়সা নিয়ে মাথা ঘামাইনি। এখন কিছু টাকার দরকার। আমার চাহিদা

সামান্য। কোনোরকমে চলে গেলেই হল। তবে কি জানো? আগে যেমন খেয়ালখুশির জীবন কাটিয়েছি এখন আর তা হয়না। তবে ব্যবসাটাতো সবে শুরু করেছি, একটু দাঁড়িয়ে গেলে তখন সোফিয়াই সামলাতে পারবে। হয়তো তখন আবার বেরিয়ে পড়তে পারব। 'তুমি নাকি এখানে একটা স্কুল খুলেছিলে 'অচিনপাখি' নাম দিয়ে?' 'হ্যাঁ ফকিরডাঙায় কয়েকঘর ফকিরছাড়া কিছু সাঁওতাল থাকে। এদের বাচ্চারা লেখাপড়া কিছুই শেখেনা। তাই কয়েকজন অর্থবান বন্ধুর সাহায্যে একটা স্কুল করেছিলাম যাতে ন্যূনতম কিছু শেখানো যায়। বাচ্চারা পড়তে আসে ডিমের লোভে। একটা করে ডিম দেওয়া হত রোজ। একজন শিক্ষিকা ছিলেন তাঁকে সামান্য কিছু টাকা দেওয়া হত। কিছুদিন চলেছিল। কিন্তু সংগঠক হিসেবে আমি খুব খারাপ। যে সব বন্ধুরা টাকা দিত, প্রত্যেক মাসে ঘুরে ঘুরে তাদের কাছ থেকে টাকা জোগাড় করে নিয়মিত স্কুল চালানো আমার পক্ষে সম্ভব না। আর আমি না গেলে বন্ধুরা টাকা দেবে না। আবার এদিকে রটে গেল লিয়াকত স্কুল খুলেছে—কিছু ছেলেমেয়ে চলে এল, বলল, চাকরি দিতে হবে। এইসব তালেগোলে হরিবোলে স্কুল উঠে গেল।

ধাবা থেকে উঠে হাঁটতে হাঁটতে মাজারে যাই। দুজনে চুপচাপ বসি। মাঝে মাঝেই ২/৩ জনের একটি করে দল আসছে। প্রার্থনা জানাচ্ছে, চাদরে চুম্বন করছে, চারপাশে ঘুরছে তবে সবই পুরুষ। মাজারে নারীর প্রবেশাধিকার নেই। তাঁরা বাইরে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছেন। মধ্যবয়সী এক মহিলা মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন। মাঝে মাঝে তাঁর শরীরটা কেঁপে উঠছে। কাপড় জামা ঠিক নেই। কিছুক্ষণ পর বোঝা গেল উনি ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। তারপরে গোঙানির আওয়াজ শোনা গেল। অর্থাৎ উনি কাঁদতে কাঁদতে প্রার্থনা করছেন।

মাজার থেকে বেরিয়ে দূরে একজনকে সাইকেল চালিয়ে আসতে দেখি। উনি আসতে আসতে স্পষ্ট হন। সাইকেলটি নতুন, তাই ঝকঝকে। প্লাস্টিকের ফুল ও ঝালর দিয়ে সাজানো সামনে ছোটো সবুজ পতাকা লাগানো। যিনি চালাচ্ছেন তার পরণে সাদা পাজামা ও লম্বা শার্ট, তার ওপর বরফি কাটা ছোটো হাতাহীন আলখাল্লা। চুল কাঁধ ছাড়িয়ে গেছে। দাড়ি বুক পর্যন্ত, জানা গেল উনি জালাল শা। সম্পর্কে লিয়াকতের শ্বশুর। আলাপ হল। কথায় কথায় বললেন, মৌলবি, আলেম এদের সঙ্গে ফকিরদের মিল হবে না কোনোদিন। চিরদিন বিরোধ আছে আর কেয়ামতের দিন পর্যন্ত থাকবে। ওরা কোরাণ নিয়েই ব্যস্ত, আমাদের তো শুধু কাগজে লেখা কোরাণ নিয়ে চলবে না, আমাদের দিল কোরাণও আছে। ওরা আমাদেরটা বুঝবে না আর আমরা ওদেরটা বুঝব, কিন্তু ওতেই মেতে থাকব না। জানালেন, প্রত্যেক বছর আষাঢ় মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আলমবাবার উরস হয়। ঐ সময় বহুলোক আসে আর আপ-ডাউন সব ট্রেন মাজারে দাঁড়ায়। ঐ তিন দিন তা অঘোষিত রেল স্টেশনে পরিণত হয়।

এখন লিয়াকতের জীবন খানিকটা বাঁধা গতে চললেও হঠাৎ কোনো বাউল

বা ফকির এসে হাজির হয়। হয়তো এক-আধ দিন থেকেও যায়। লিয়াকত তাকে নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত। গান চলছে। তামাক চলছে, কথা চলছে। ওর কাছে জালাল শার, অর্থাৎ ওর শ্বশুরের কথা জানতে চাই। ও বলে 'জালাল শা এক আশ্চর্য মানুষ। নিজের বলতে কিছু নেই, মাটির ঘরটুকুই সম্পত্তি। মানুষের ভালবাসার দানেই তাঁর সংসার চলে। সঙ্গে সবসময়ই তিন-চারজন লোক আছে। তিনি খেলে তারাও খাবে। তাঁর যদি সবাইকে খাওয়ানার পয়সা না থাকে তাহলে নিজেও খাবেন না, কাউকে বলবেনও না। নিজের যেমন কিছু নেই গানের গলাটা ছাড়া, তেমন কিছু না থাকার উদ্বেগও নেই। বরং ঘরে কেউ এসে পড়লে কীভাবে তাঁকে সেবা করা যায় তাতেই উনি ব্যস্ত হয়ে পড়বেন।'

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়। জালাল শা-র দাওয়ায় বসি। কেরোসিনের আলোয় অন্ধকার স্পষ্ট হয়। জালাল শা-র হাতে কেউ ছিলিম তুলে দেয়। উনি দুটো ফুঁকো টান দিয়ে লম্বা একটা টান মেরে পাশের জনকে দেন। বলেন 'আমাদের আলমবাবার মাজারে কোনো ভিন্নভাব নেই। এখানে সবাই এক হয়ে যায়। কী হিন্দু, কী মুসলমান, কী খ্রিষ্টান। ফকিরি তত্ত্বে বলছে ছত্রিশ জাতের মানুষকে যদি এক না করা যায় তাহলে কীসের ফকিরি? যে করতে পারেনা সে ফকির নয়।' কথা থামিয়ে হাত ঘুরে আসা ছিলিমের সেবা শেষে মিটিমিটি হাসলেন। তারপর দোতারাটা তুলে নিয়ে গান ধরলেন :

যদি পারে যাবে পড়ো সালেওয়াল্লা/যদি পারে যাবে পড়ো সালেওয়াল্লা/রোজ হাসরে তরাবেন হাবিবুল্লা/যদি পারে যাবে পড়ো সালেওয়াল্লা/যদি পারে যাবে পড়ো সালেওয়াল্লা/সেই পার ঘাটাতে বা রেল ষ্টেশানে/টিকিট পাবে না ইমান ধন বিনে/আহা পারেরই মালিক এক রসুলউল্লা/যদি পারে যাবে পড়ো সালেওয়াল্লা

গান শেষে লিয়াকতের দিকে তাকাই। তার মুখের ভাবটা হল কী বুঝলে? কী বুঝেছি তা বলতে যাওয়ার মূর্খামি আর করিনি। হঠাৎ দেখি হাইওয়ে থেকে উঁচুনিচু মাঠ ভেঙে এগিয়ে আসছে বিরাট ট্রাক, তার হেডলাইটের আলো একবার উঠছে, একবার নামছে। কী ব্যাপার? লিয়াকত বলে 'আজ বৃহস্পতিবার তো। ট্রাক ড্রাইভার আলম বাবার কাছে দোয়া মাঙতে আসছে।' অন্ধকার মাঠে ট্রাকের এগিয়ে আসা দেখে মনে হয় এক অদ্ভুত চতুষ্পদ নিশাচর প্রাণী হাজির হল মাজারে।

ইতিমধ্যে আমরা উঠে যাই লিয়াকতের ঘরের সামনে। সাত-আট পা কি দশ পা দূরে রেললাইন। সোফিয়া চা দেয়, লিয়াকত তামাক ধরায়। আমি বলি 'ফকিরদের কথা বল।' লিয়াকত হাসে। কী করবে শুনে? 'আমার জানতে ইচ্ছে করছে।' তুমি চাইলেই তারা জানাবে কেন? চুপ করে যাই। একটু পরে বলি 'বন্ধুত্ব তো হতে পারে।' তারা তোমাকে বন্ধু ভাববে কেন?

এরপর আর কথা চলে না। চুপচাপ বসে থাকি। লিয়াকত একমনে তামাক খেয়ে চলে। একসময়ে মুখ খোলে 'ফকিরদের কথা আমি বলতে পারব না। আমার কথা বলতে পারি। স্কুল জীবনটা হস্টেলেই কেটেছে তাই ধর্মের সঙ্গে খুব একটা

ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ কোনোদিনই তৈরি হয়নি। একবার মা জোর করে মসজিদ পাঠিয়েছিল। আমি তো কিছুই জানি না পাশের লোকে যা করছে তাই করলাম আর বিড় বিড় করে যা পারলাম বললাম। পরে দেখেছি ঈদের দিন সবাই নমাজ পড়তে যায় ইদগায়। বড়রা নমাজ পড়ে আর নতুন জামা কাপড় পরা বাচ্চাগুলোকে জুতো পাহারা দিতে বলে, প্রয়োজনে পয়সাও দেয়। তার মানে যারা নামাজ পড়তে এসেছে তাদের মধ্যে চোরও আছে বলে মনে করছে নমাজীরা। শরিয়তের নমাজ যদি মানুষের মন থেকে এইটুকু সন্দেহ দূর না করতে পারে, সহ নমাজীর প্রতি এই সামান্য বিশ্বাসের জন্মটুকু না দিতে পারে তাহলে ওই নমাজ পরে কী লাভ। তাই ফকিররা বলে ওই লোক দেখানো নমাজ পড়ার কোনো মানে নেই। মারফতি জ্ঞান ছাড়া মানুষ হওয়া যায় না, প্রকৃত নমাজ পড়াও হয় না। মৌলবি আর গোঁড়া মুসলমানরা এসব সহ্য করে না। তাই তারা ফকিরের দোতারা ভাঙে, চুল-দাড়ি কাটে পারলে পাড়া থেকে উৎখতে করে দেয়। ফকিরি পন্থাটাই হল আত্ম উপলব্ধির, আত্ম অনুশীলনের পথ। মৌলবির ভাষণ হল মুখস্থ করা যান্ত্রিক কাঠখোট্টা বকবকানি। ফকিরের গানে থাকে দেহ সাধনার কথা, সেখানে পৌঁছতে না পারার জন্য আত্মধিক্কার আর কান্না। তবু ফকিররা এক রকম আনন্দে থাকে। কেউ এলে তাকে সেবা ভালবাসায় ভরিয়ে দেয়। মনেপ্রাণে আমিও এই জীবন চাই। কিন্তু চাইলেই তো পাওয়া যায় না। আমার জ্ঞান-বুদ্ধি আমাকে বোঝায় ফকিরের পথে অতটা হেঁটো না হারিয়ে যাবে। সত্যিই আমার যোগ্যতা নেই। ঠিক করেছিলাম একমাস মিথ্যে কথা বলব না। সামান্য এই প্রতিজ্ঞাটুকু রাখতে পারলাম না। আমি ফকির জীবনচর্যার যোগ্য নই। একথা ভাবলে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যায়।